

১৬ জুলাই: আত্মত্যাগের আলোয় লেখা ইতিহাস

এ এম ইমদাদুল ইসলাম

জুলাই মাসের আলো অন্যরকম। বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশ, ভেজা পথ, বাতাসে জমে থাকা অস্থিরতা-সব মিলিয়ে এই মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে বারবার গুরুত্বপূর্ণ বাঁক এনে দিয়েছে। কিছু জুলাই এসেছে উৎসব নিয়ে, কিছু এসেছে দুর্খোগের সংবাদ নিয়ে। আবার কিছু জুলাই রেখে গেছে এমন স্মৃতি, যা কেবল একটি পরিবারের নয়, পুরো জাতির হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে দিয়েছে।

ইতিহাসের কিছু দিন ক্যালেন্ডারের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না; সময়ের প্রবাহে সেগুলো একটি জাতির স্মৃতি, অনুভূতি ও আত্মপরিচয়ের অংশ হয়ে ওঠে। ১৬ জুলাই তেমনই একটি দিন, শহিদ আবু সাঈদকে স্মরণ করার দিন। একজন তরুণ, যাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং যাঁকে মানুষ সাহস, আত্মত্যাগ ও প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে স্মরণ করে।

ইতিহাসের একটি নির্মম বৈশিষ্ট্য হলো, সব সময় বিখ্যাত মানুষদের দিয়েই তা লেখা হয় না। কখনো কখনো একেবারে সাধারণ একজন মানুষের জীবনও অসাধারণ অর্থ বহন করে। একজন তরুণ, যাঁর হয়তো ছিল অসংখ্য ব্যক্তিগত স্বপ্ন, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা, হঠাৎই তিনি চলে আসেন জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে। তাঁর অনুপস্থিতি হয়ে ওঠে তাঁর উপস্থিতির চেয়েও বড়ো।

যে সময়ে আবু সাঈদ আলোচনায় আসেন, তা ছিল উত্তেজনা, বিতর্ক আর সামাজিক অস্থিরতায় পূর্ণ এক সময়। দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা দাবি-দাওয়া, মতপ্রকাশ ও জনসমাবেশ নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা চলছিল। এই প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শুধু সংবাদের শিরোনামেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা স্পর্শ করেছে মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি, সামাজিক সম্পর্ক এবং জাতীয় চেতনাকেও। আবু সাঈদের মৃত্যু মানুষকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে রাষ্ট্র, সমাজ, নাগরিক অধিকার এবং মানবিক মর্যাদা নিয়ে। একটি জাতির ইতিহাসে তরুণদের ভূমিকা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের স্বপ্ন, ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা এবং একটি উন্নত সমাজ গড়ার প্রত্যাশা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এসব সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয় তরুণদের মধ্যেই। সেই ধারাবাহিকতায় আবু সাঈদের নামও আজ বহু মানুষের স্মৃতিতে বিশেষ একটি স্থান দখল করে আছে। তাঁর জীবন ছিল একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর জীবন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু তাঁকে করে তুলেছে জাতীয় আলোচনার অংশ।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, ইতিহাসে কিছু মানুষ নিজের জীবনের চেয়েও বড়ো একটি প্রতীকে পরিণত হন। ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়িয়ে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন এক বৃহত্তর অনুভূতির। অনেকের কাছে আবু সাঈদ ঠিক সেই ধরনের প্রতীক, যেখানে সাহস, প্রতিবাদ ও আত্মত্যাগ একসূত্রে গাঁথা। তাঁকে স্মরণ করার অর্থ শুধু একজন ব্যক্তিকে স্মরণ করা নয়; বরং এমন সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবা, যা একটি সমাজকে আরও ন্যায্যভিত্তিক, মানবিক ও সহনশীল করে তুলতে পারে। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে তাই অনেকের মনে জেগে ওঠে তরুণদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা। আবু সাঈদের মৃত্যু বহু মানুষের কাছে এক বেদনাময় স্মৃতি। এই স্মৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি মানুষের জীবন অমূল্য। মতভেদ, সংকট কিংবা রাজনৈতিক-সামাজিক বিরোধ, যে কারণেই হোক না কেন, একটি প্রাণহানি জাতির জন্য গভীর বেদনার বিষয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আজকের তরুণেরা এমন এক পৃথিবীতে বেড়ে উঠছে, যেখানে তথ্যের প্রবাহ দ্রুত, মতের বৈচিত্র্য বিস্তৃত এবং পরিবর্তনের গতি অভূতপূর্ব। এই বাস্তবতায় তাদের সামনে যেমন সৃষ্টি হয়েছে নতুন সুযোগ, তেমনই বেড়েছে দায়িত্বও। আবু সাঈদকে ঘিরে আলোচনা তরুণদের সামনে তুলে ধরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কীভাবে একজন সচেতন নাগরিক হওয়া যায়? মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বজায় রাখা যায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা? কীভাবে একটি সমাজে শক্তিশালী করা যায় ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও সংলাপের সংস্কৃতি?

এই প্রশ্নগুলোর সহজ উত্তর নেই। তবে ইতিহাস বলে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন, পারস্পরিক সম্মান এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মতপ্রকাশ, এসবই একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি। কোনো জাতি তখনই পরিপক্ব হয়, যখন সে তার আনন্দের পাশাপাশি বেদনাকেও স্মরণ করে। স্মরণ করার উদ্দেশ্য অতীতকে আঁকড়ে ধরা নয়; বরং সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা।

১৬ জুলাই আমাদের সেই দায়িত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শহিদ আবু সাঈদকে স্মরণ করার অর্থ হওয়া উচিত মানবিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করা, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং এমন একটি সমাজ গড়ার চেষ্টা করা, যেখানে মানুষের জীবন ও মর্যাদা পায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব। একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে তার অবকাঠামো, অর্থনীতি বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি

তার মানবিক চরিত্রেও। যে সমাজে মানুষ নিরাপদে মত প্রকাশ করতে পারে, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে, সেই সমাজই দীর্ঘমেয়াদে এগিয়ে যায় টেকসই উন্নতির পথে।

আজ যখন আমরা শহিদ আবু সাঈদকে স্মরণ করি, তখন একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখি এমন একটি বাংলাদেশের, যেখানে তরুণেরা ভয় নয়, আশা নিয়ে এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতের দিকে; যেখানে ভিন্নমত হবে না বিভাজনের কারণ; যেখানে সংলাপ, ন্যায্যবিচার এবং মানবিকতা হবে জাতীয় জীবনের মৌলিক ভিত্তি।

আবু সাঈদের মতো ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই মারা গিয়েছিলেন আরো পাঁচজন। তাদেরই একজন শহিদ ওয়াসিম আকরাম। চট্টগ্রামের মুরাদপুরে তিনি শহিদ হন। ওয়াসিমের মৃত্যুও আন্দোলনের স্কুলিঙ্গাকে আরো বেগবান করে। মাত্র ২৩ বছরের টগবগে যুবক শহিদ ওয়াসিম ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী এবং চট্টগ্রাম কলেজ শাখা ছাত্রদলের আত্মায়ক কমিটির সদস্য। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শহিদ ওয়াসিম আকরাম।

২০২৪ সালের ১৬ জুলাই চট্টগ্রামের মুরাদপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন পুলিশ ও ছাত্রলীগের দ্বিমুখী সংঘর্ষে তিনি গুলিবিদ্ধ হন ছাত্রদলের এ নেতা। পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। জুলাই যোদ্ধা শহিদ ওয়াসিম আকরামের অবদানকে জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে চট্টগ্রামের এক্সপ্রেসওয়ের নামকরণ করা হয় শহিদ ওয়াসিম আকরাম উড়ালসড়ক।

২০২৬ সালের জুনের মাঝামাঝি সময়ে সরকারপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পেকুয়ায় ওয়াসিমের কবর জিয়ারত করেন। নিজ দলের কর্মী হিসেবেই নয়, জুলাই যোদ্ধা হিসেবে এ সম্মান ওয়াসিমের প্রাপ্য। একজন শহিদের গল্প কখনো একজন মানুষের গল্প নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি পরিবারের ভাঙা স্বপ্ন, এক মায়ের আজীবনের কান্না, এক বাবার নীরব দীর্ঘশ্বাস। ওয়াসিম আমাদের শিখিয়ে গেছেন-একটি প্রাণ হারানো মানে শুধু একটি জীবন নিভে যাওয়া নয়, একটি সমাজ, একটি দেশ বদলে যাওয়া।

অনেক মানুষের জীবন ঠাঁই পায় ইতিহাসের বইয়ে, আবার কিছু মানুষ বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয়ে। আবু সাঈদের স্মৃতি বহু মানুষের কাছে সেই দ্বিতীয় পথের অংশ। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে অনেকের মনে পড়ে সাহস, আত্মত্যাগ এবং একটি উন্নত সমাজের আকাঙ্ক্ষার কথা। তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান শুধু আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা নিবেদনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এমন একটি সমাজ গড়ার চেষ্টায়, যেখানে ন্যায়, সহমর্মিতা এবং মানবিক মর্যাদা হয়ে উঠবে প্রতিদিনের চর্চার অংশ।

আবু সাঈদের স্মৃতি তাই শুধু অতীতের দিকে তাকানোর আহ্বান নয়; এটি ভবিষ্যতের প্রতিও একটি দায়বদ্ধতা। একটি জাতির শক্তি যেমন প্রকাশ পায় তার অর্থনীতি, অবকাঠামো কিংবা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে, তেমনি প্রকাশ পায় মানুষের প্রতি তার সম্মানে। মতের ভিন্নতা, সামাজিক উত্তেজনা কিংবা রাজনৈতিক বিরোধ, এসব যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতা হতে পারে। কিন্তু সেই বাস্তবতার মধ্যেও মানবজীবনের মর্যাদা, আইনের শাসন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অটুট রাখাই একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। এই দিনটি তাই একটি জাতির জন্য আত্মজিজ্ঞাসারও দিন, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, কোথায় যেতে চাই, আর আগামী প্রজন্মের জন্য কেমন বাংলাদেশ রেখে যেতে চাই। আমরা প্রত্যাশা করি এমন এক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, যেখানে তরুণেরা স্বপ্ন দেখতে পারবে নির্ভয়ে। যেখানে মতের পার্থক্য থাকবে, কিন্তু প্রতিটি মানুষের জীবন হবে সম্মানিত, মর্যাদা পড়বে না প্রশ্নের মুখে। যেখানে সংলাপ হবে সংঘাতের চেয়ে শক্তিশালী, মতভেদের সমাধান হবে শান্তিপূর্ণ পথে, আইনের শাসন হবে সুদৃঢ়, আর মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায্যবিচার হবে জাতীয় অগ্রগতির সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তি।

ইতিহাসের প্রতিটি আত্মত্যাগ আমাদের কাছে রেখে যায় একটি প্রশ্ন, আমরা সেই ত্যাগ থেকে কী শিক্ষা নিলাম? ১৬ জুলাই সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দিন। আর সেই উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়েই শহিদ আবু সাঈদের স্মৃতি বেঁচে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, শ্রদ্ধায়, চিন্তায় এবং একটি আরও মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্নে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার